



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 251 - 259

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

গল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের বাস্তব-দর্শন

মৌলিকা সাজওয়াল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : moulikasajwal92@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024

Selection Date 01. 02. 2025

Keyword

Dibyendu
Palit, story,
realistic,
mechanism,
urban, megacity,
life, darkness,
helplessness.

Abstract

Life in a megacity is a constant performance. Crowds fill the streets, yet people are islands, drifting through seas of strangers. The rhythm is restlessness: rushing to work, chasing deadlines, navigating traffic, and returning to space that feel less like homes and more like temporary shelters. Time is currency, and no one seems to have enough of it to pause, connect, or even notice. Faces are full of facades and go through a training of corporate smiles, polite nods, but behind this Facades, the realities are raw and unpolished. Anxiety, loneliness and exhaustion simmer beneath the surface. In the inner world of city life, people are striving, sacrificing and often, quietly breaking. Relationships feel transactional. Conversations skim the surface, seldom delving into the depths of fear, dreams and struggles. Urban life thrives on ambition, but it often starves the soul. People become shadows of themselves, walking a tightrope between dreams and survival, with little room for authenticity in the chaos. City glows with glamour and brightness, but inside those lit windows are countless stories of solitude, nakedness and vulnerability. Dibyendu Palit captures those dark stories of city life without any filter. He presents his characters with their raw core of flesh and blood. These unmasked faces often startle us, sometimes leave us amazed. His stories hold up a mirror to our own faces, forcing us to confront ourselves. Dibyendu Palit essentially speaks of the preparatory phase of present dominance of artificial intelligence, highlighting the confusion and helplessness of people entangled in the intricate mechanisms of machines during this period.

Discussion

“দিব্যেন্দুর সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে একদম বহির্মুখী নয়। খুবই ইন্ট্রোভার্ট। এটা আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া খুবই অনেস্ট। কখনও কোনো অন্যায়ে সজে আপোস করতে দেখিনি। আর খুব পাণ্ডুয়া। যাকে যে সময় দেয় তার নড়চড় করে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজটুকু করার চেষ্টা করে।”^১

নন্দিতা রায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দিব্যেন্দু পালিতের স্ত্রী শ্রীমতি কল্যাণী পালিত তাঁর অন্তরমহলপ্রেমী স্বামী সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি পোষণ করেছেন, দিব্যেন্দু পালিতের গল্প, উপন্যাসের কোণাখামচি পর্যন্ত সেসবের সাক্ষ্য বহন করে। গল্পের ঘনঘটার বিপুল আয়োজন করে পাঠক মজানো লেখা তিনি লিখতেন না। স্বভাবজ অন্তর্মুখিনতা তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে নিত্তনৈমিত্তিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ, একঘেয়ে ঘটনা প্রবাহকে নিবিড়ভাবে কাটাছেঁড়া করার দিকে। সংসারের কিছু চিরন্তন সত্য, মানুষের অনুভূতি প্রবণতা, মানসিক অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত সুতীর দহন এবং শেষপর্যন্ত কখনো প্রবৃত্তির কাছে, কখনো আবেগের কাছে মানুষের করুণ পরাজয়ের গ্লানিরঞ্জিত রক্তাক্ত মনের অলিতে-গলিতে ভ্রমণ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত। সাইম বন্ডোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন —

“মনে পড়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুদ্ধদেব বসু একবার কোনও এক প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন যে, কল্পনাশক্তি, কাহিনিবয়নের ক্ষমতা, চরিত্র-নির্মাণ ও সংলাপ-রচনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে যে-কেউ একটু চেষ্টা করলেই লেখক হতে পারেন। তবে ‘সাহিত্যিক’ হতে গেলে দ্রষ্টা হতে হয়। কথাগুলি সেই থেকে আমার মনে গ্রথিত।”^২

বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত দিব্যেন্দু পালিত কোনোদিনই লেখক হতে চাননি, চেয়েছিলেন ‘সাহিত্যিক’ হতে। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে রয়েছে সেই সুরে ধ্বনিত নিবিড় পর্যবেক্ষণ, মর্মস্থল থেকে তুলে আনা গভীর দর্শন।

১

দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম এই বাংলায় নয়। তিনি ১৯৩৯ এর ৫ই মার্চ রবিবার রাত ১০ টায় বিহারের ভাগলপুরে জন্মেছিলেন। বগলাচরণ পালিত এবং নীহারবালা পালিতের এগারো জন সন্তানের একজন ছিলেন তিনি। ভাগলপুরের দুর্গাচরণ হাই স্কুলে এবং তারপরে স্থানীয় মারোয়াড়ি কলেজ থেকে বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর ১৯৬১ সালে তিনি কলকাতায় এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। খুব অল্প বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। সমগ্র পরিবারসহ সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। কল্যাণী দেবী জানিয়েছেন, লেখক ব্যক্তিজীবনেও অত্যন্ত দায়িত্ববান ছিলেন। সাধারণত কবি-সাহিত্যিকদের আমরা সাধারণ মানুষেরা যেমনভাবে ভাবতে অভ্যস্ত — সংসার বিচ্ছিন্ন, হুজুগে, উড়নচণ্ডী, ভাবলুতায় ভাসমান, নিজের কল্পনার জগতে মজে থাকা শরিক, দিব্যেন্দু পালিত কিন্তু এই সাধারণীকরণের একেবারে বাইরের একজন মানুষ। ছোটো থেকে সংসার সামলানো, বন্ধুত্ব পালন ব্যক্তিজীবনের এই দায়িত্ববোধ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। সংসার সামলানোর জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো একজনকে নির্দিষ্ট সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। দায়িত্ব নেওয়ার যে গল্প প্রতিটা সংসারের পিছনে লুকিয়ে থাকে সেই বহু পরিচিত অথচ অবজ্ঞাভরা গল্পগুলোকে সযত্নে তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তিনি। যেমন ‘মাছ’ (১৩৬৪) গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই একটি নিতান্ত সাধারণ, সমাজের চোখে গুরুত্বহীন, অবহেলিত একটি মেয়েকে (নিরুপমা)। সে বৃদ্ধ বাবা, শয্যাশায়ী মা, দুটি ছোটো ছোটো ভাই এবং একটি অবিবাহিত বোনের সাংসারিক দায়ভারে ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত। বিষাদময় সুরুশ প্রাণহীনতা এই গল্পের প্রাণ। পেটের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা, যৌন-ক্ষুধা সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসারের ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে মেয়েটি কেবলমাত্র দায়িত্ববোধ থেকে। প্রেমের হাতছানি, বিয়ের স্বপ্ন তার জীবনেও এসেছিল দাদার বন্ধু বিজনের হাত ধরে। কিন্তু পরিবারের মুখ চেয়ে সে নিজের স্বপ্নের সলিল সমাধি তৈরি করেছে নিজে হাতে, সুখের রঙিন চশমা খুলে চোখ ঝলসে নিয়েছে সংসারের দাবদাহে। গল্পটি একটি উদবাস্ত পরিবারের গল্প। অর্থাৎ, ৪৭ এর অব্যবহিত পরের তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে গল্পের পিছনে অথচ গল্পের কোথাও খুব সুস্পষ্টভাবে রাজনীতির নাম-গন্ধ নেই। দিব্যেন্দু পালিতের গল্পগুলি অধিকাংশই এরকম রাজনৈতিক ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে লেখা। বহিরাঙ্গিক উত্তপ্ত রাজনৈতিক ঘটনার চেয়ে ঘটনার ফলাফলস্বরূপ রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান পরিবারতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির চর্চা করায় তিনি অনেক বেশি আগ্রহী। তাঁর গল্পে ছড়িয়ে থাকে অন্তঃপুরের রাজনীতি। আর আমাদের দেশের অন্তঃপুর মূলত নারীমনের অন্তঃপুর। ‘মাছ’ গল্পেও প্রধানত

নিরুপমার মনের খবর দেওয়ার সূত্রে পরিবেশিত হয়েছে উদবাস্তু পরিবারগুলির সামাজিক অবস্থান। নিরুপমার মনকে কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে তার এক অদ্ভুত উত্তরণ লেখক দেখিয়েছেন। অন্ধকার জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দু-দণ্ড সময় কাটানোর জন্য অন্ধকার একটি জায়গায় নিশ্চিন্তে বসেছিল নিরুপমা। আকস্মিকভাবে চোখের সামনে তাদের মতো আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন, প্রায় সমমানের সামাজিক অবস্থানবিশিষ্ট একটি পরিবারে এক টুকরো মাছ নিয়ে একটি বাচ্চা ছেলে এবং রান্সুসে চেহারার এক বৃদ্ধার মধ্যকার মারপিট দেখে তার মনের সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়। সে তার প্রেমিক বিজনদার সুখ আর নিরাপত্তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে, এতদিনকার স্বপ্নের মোহ-ভঙ্গ করে লড়াই জারি রাখবার পথকেই বেছে নেয়। অন্ধকারে বসে অন্ধকার থেকে উত্তরণের স্বচ্ছ, দৃঢ় পথ বেছে নেয় নিরুপমা। সে বোঝে বিজন তার একার আশ্রয়স্থল আর সে নিজে পরিবারের আরও পাঁচটি মানুষের আশ্রয়, ভরসা স্থল। তাই তাকে হতে হবে শক্ত, দায়িত্ববান। সে নিজের সমস্ত বেদনাকে পাথরের মতো বুক জমিয়ে মাকে জানায়, -

“তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মা। আমার বিয়ে দিও না। আমি বিয়ে করতে পারব না।”^৩

দায়িত্ববোধ— চরিত্রের এই বিশেষ দিকটির বশেই খুব সম্ভবত দিব্যেন্দু পালিত শুধু লেখালিখিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেননি। আপসহীন সততার কারণে বৈবাহিক জীবনের শুরুতেই চাকরি ছেড়েছেন বটে, কিন্তু আবার নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। একদম শুরুর দিকে তিনি জ্বালানি ব্যবহারের সমীক্ষকমণী থেকে শুরু করে অডিট ফার্মের দিনমজুরের অ্যাসিস্ট্যান্টগিরির পদ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। অবশেষে, ১৯৬১ সালে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের* সাব-এডিটর হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানে অপছন্দের কিছু একটা ঘটায় দুম্ করে চাকরি ছেড়ে দেন। তবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকার দরুন কিছুদিন পরই প্রথমে অ্যাডার্টস অ্যাডভার্টাইজিং এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে *ক্ল্যারিয়ন-ম্যাকান*, *আনন্দবাজার* এবং *দ্য স্টেটসম্যান* সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কিছুদিন *যুগান্তর* এবং *অমৃতবাজার পত্রিকার* সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯৮৭ সালে ফের *আনন্দবাজার পত্রিকায়* সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। তিনি মূলত *রবিবাসরী* এবং সংস্কৃতি বিভাগের দিকটি সম্পাদনা করতেন। এরপর ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে অবসর নেন। পরবর্তী উনিশ বছর লেখক হিসেবে জীবন কাটানোর পর ২০১৯ এর ৩রা জানুয়ারি মারা যান।

২

নিতান্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতাবলে কোলকাতায় এসে অত্যন্ত ক্ষমতাবান, খ্যাতিমান একজন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অথচ তাঁর স্ত্রী এবং সতীর্থেরা বারবার তাঁর সততা ও চারিত্রিক সংযমের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিও এমনই দৃঢ়, স্বজ্ঞ, আঁটসাতো, পরিমিতির নামান্তর। উপন্যাসগুলি খুব বেশি হলে বারো ফর্মার আর গল্পগুলিও পাঁচ-দশ পাতার বেশি পথ পেরোয় না। বাড়তি শব্দ, আবেগের উচ্ছ্বাস দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে রামগুড়ুরের ছানার মতোই সংযত। অথচ গল্পে সমাজ, পারিবারিক কাঠামো, মানুষ-মানুষে সম্পর্ক, বিশেষত প্রেম বা দাম্পত্য সম্পর্ক, ব্যক্তি মানুষের খুঁটিনাটিকে তিনি মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে চিরে চিরে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের গল্প পাঠের অভিজ্ঞতাকে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ই (১৯৩৩—২০০৫) যথার্থ আখ্যায় ভূষিত করেছেন—‘দি অ্যানাটমি ক্লাস অফ ডক্টর দিব্যেন্দু পালিত’। তাই হয়তো তাঁর গল্পের গতি কিছুটা বা শ্লথ। তাতে মানসিক দ্বন্দ্বজনিত টেনশন, সম্পর্কের টানাপোড়েন এলেও ঘটনাবহুল উত্তেজনা বা চোর-পুলিশ ধরার উৎকণ্ঠা প্রায় নেই বললেই চলে। *অন্তর্ধান* (১৯৮৯) উপন্যাসটি এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী, তবু সেখানেও ঘটনার তুলনায় মানসিক টেনশন, সম্পর্কের টানাপোড়েনের দিকে লেখকের পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিল। দিব্যেন্দু পালিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯৩৫) তাঁর লেখা সম্পর্কে ‘ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন’-এর মতো করে মাপা, বিপুল সংযম নিয়ে শব্দ ব্যবহারের কথা বলছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিককে চিহ্নিত করছেন। তিনি বলছেন —

“ওকে আমি একটা আত্মজীবনীমূলক লেখা লিখবার জন্য বলেছিলাম। ও যখন ভাগলপুরে ছিল, খুব কালারফুল জীবন ছিল ওর। বছরকমের মজার ঘটনা, মজার চরিত্র ও দেখেছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে

কখনও লেখেনি। লেখকদের কতগুলো পছন্দের ব্যাপার আছে। যে কি নিয়ে লিখব। কাদের নিয়ে লিখব আর কাদের নিয়ে কখনই লেখে না। কিন্তু ওর কাছে যখন ওর ছেলেবেলার ঘটনাগুলো শুনি, খুব মজা লাগে, খুব উপভোগ করি। ভাগলপুরের যে স্মৃতি ওর আছে তা নিয়ে বেশ বড়সড় একটা ভাল উপন্যাস তৈরি হতে পারে। কিন্তু দিব্যেন্দু ওর লেখায় কখনও সেইসব স্মৃতির ছায়া পড়তে দেয়নি। ওর ভেতরে একটা অদ্ভুত একক নাগরিকত্ব আছে।”^৪

দিব্যেন্দু পালিত অধিকাংশ সময়ই কলকাতাকে বেছে নিয়েছেন তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে। বহু নদ-নদী এসে যেমন মহাসাগরের বুকে মিলিয়ে যায়, তেমনি কোলকাতা এমন এক বিচিত্র শহর যা পুষ্ট হয়েছে বাংলার সব আচার-বিচার, সংস্কার, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, গ্রামীণ সংস্কৃতি, আদর্শ শিল্পকলা, রুচিবোধ এবং মানবিকতাকে গুঁষে নিয়ে। ঐতিহাসিক লুই মামফোর্ড (১৮৯৫—১৯৯০) মহানগর সম্পর্কে বলেছিলেন —

“This metropolitan world, then is a world where flesh and blood is less real than paper and ink and celluloid. It is a world where the great masses of people, unable to have direct contact with more satisfying means of living, take life vicariously, as readers, spectators, passive observers: a world where people watch shadow-heroes and heroines in order to forget their own clumsiness or coldness in love... They become victims of phantasms, fears, obsessions, which blind them to ancestral patterns of behavior.”^৫

মহানগরের এই কুৎসিত দিকগুলির সমালোচনা করে দিব্যেন্দু পালিত যেন একপ্রকার কলকাতাকে বেধের উপর দাঁড় করিয়ে কড়া মাস্টারমশাইয়ের মতো শাসন করে গেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। যেমন ধরা যাক ‘সিগারেট’ (১৩৭৯) গল্পে আমরা দেখতে পাব একজন মধ্যবিত্তকে যার দামি সিগারেট ছাড়া দিন চলে না। সিগারেট তার কাছে এক বিকৃত ‘obsession’। মধ্যবিত্তের মতো বাসে ট্রামে চড়ে দিন কাটালেও রাজা-রাজড়ার মতো করে মৌজ নিয়ে সে যখন দামি ধোঁয়া টানে তখন সে উচ্চবিত্তের ভূমিকায় অভিনয় করে কিছুক্ষণের জন্য পরম তৃপ্তির আবেশে মজে ওঠে। এই লোকটিই একদিন সিগারেটের বসন্ত হাওয়া শুষতে শুষতে বাস ধরতে গিয়ে একজন ‘কুলি-চেহারার লোকের’ সঙ্গে ধাক্কা খায়। সিগারেটের ফুলকিতে তার টেরিলিনের দামি শার্ট বুকের কাছে সিকি ইঞ্চি পুড়ে গেছে দেখে বেদম তর্জন-গর্জন করতে যায় লোকটির ওপর, কিন্তু দেখে তার ছাইসুন্দর জ্বলন্ত সিগারেটটি রাজকীয় মেজাজে লোকটির চোখের নীচের চামড়ায় চেপে বসে আছে। অথচ সমগ্র ঘটনার নিরিখে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে নিম্নবিত্ত লোকটি। সিগারেট টেনে উচ্চবিত্ত হওয়ার ক্ষণিক সম্মোহনের জালকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দেয় এই দৃশ্য। বিত্তগত অবস্থানজনিত অসম্মান, মেকিপনার মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছেন দিব্যেন্দু পালিত একজন নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর প্রতি একজন মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীর নিদারুণ আচরণের ছবি তুলে ধরে।

৩

দিব্যেন্দু পালিত কোনোদিন খুব বিখ্যাত হওয়ার জন্য লেখেননি। যেমনটি তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি কোনোদিনই বহির্মুখী ছিলেন না। তাই হয়তো তাঁর রোমাঞ্চকর আত্মজীবনীর কিয়দংশেরও সন্ধ্যাবহার করেননি তাঁর রচনায়। *আনন্দবাজার*-সহ কত নামিদামি পত্রিকার ক্ষমতাবান এডিটর ছিলেন তিনি। চাইলেই জনপ্রিয়তার পথ বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর বিনম্র একরোখা মন লোকরঞ্জনের মোহমুক্ত গভীর জীবন দর্শন খুঁজে ফেরার পথেই অগ্রসর হয়েছে। তাঁর এই নির্লোভ দার্শনিকতা প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন —

“জনপ্রিয় হব, লেখাটা বিক্রি হবে এরকম কোনও অ্যাটিটিউড ওর মধ্যে নেই। আমি ওকে বলে বলেও এই মনোভাব পাঁচাতে পারিনি। ও যা লিখবে তা লিখবেই... জনচিন্তামুখী হবেই এরকম লেখা যে লিখতে পারে না তা তো নয়, পারে, কিন্তু কিছুতেই লিখবে না। যখন আমরা আড্ডা দিই, বৈঠকী মেজাজে গল্প – সল্প করি তখন ওর বহুল কর্মব্যস্ত জীবনের নানা কথা শুনি... কতোবার ওকে বলেছি এগুলো লিখিস

না কেন। এসব অমূল্য জিনিস তো পরে হারিয়ে যাবে। কিন্তু ওকে দিয়ে লেখাতে পারিনি। হয়তো মনে করে যে সেগুলো ওর চরিত্র বহন করবে না...এইসব সতর্কতা ওর আছে। আর আছে খুঁতখুঁতুনি। লিখে যেন সন্তুষ্ট হতে পারে না। নিজের লেখার মধ্যেই নানারকম অসম্পূর্ণতা আবিষ্কারের চেষ্টা করে। আর একটা কথা আমরা যেমন নানারকম ধরনের লেখা লিখি, থানিকটা অসতর্ক লেখাও লিখে ফেলি, দিব্যেন্দু সেটা করে না...যেমন ফিচার ও লেখে না, সায়েন্স ফিকশন নিয়ে ভালো লিখতে পারতো, কিন্তু সেখানে ঢোকেনি...আমরা হয়তো দশবার সিদ্ধান্ত পাঁচটাতে পারি, কিন্তু ওর সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না। একবার লিখবো না ঠিক করলে ওকে দিয়ে লেখানো মুশকিল। ওর দৃঢ় মানসিকতার এটা একটা দিক।”^৬

গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত ব্যক্তি জীবনে যেমন সৎ, দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই ছিলেন তাঁর লেখার প্রতি। তাঁর গল্পগুলিও প্রায় একগামী, যার একমাত্র কাজ শহুরে মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, মানবিকতা, সত্যতার পাশাপাশি দ্বিচারিতার কুৎসিততম দিকগুলি আয়নার মতো করে আমাদের সামনে তুলে ধরা। তিনি লেখেন মূলত শহরবাসী বা মফঃস্বলবাসী মধ্যবিত্ত পাঠকদের জন্য। তাদের জন্যই তাঁর একগামী নিরলস সাধনা। তাঁর পরিচিত জগতের ক্ষেত্র যতই বড়ো হোক না কেন তিনি শহরের পরিধির বাইরে যাবেন না, গেলেও বড়োজোর মফঃস্বল বা রহস্যময় নামহীন, ভৌগোলিক অস্তিত্ববিহীন কোনো জায়গা। এই প্রসঙ্গে দুটি গল্পের কথা বলা যায়, ‘নিয়ম’ এবং ‘অন্ধকার পেরিয়ে’। প্রথমটি রসুলগঞ্জ এবং দ্বিতীয়টি বেগমগঞ্জ নামের কোনো এক রহস্যময় জগতের কাহিনি। সেসব জায়গার রোজকার ছায়াছবি অনেকটা এই রকম —

“...এক রহস্যময় অন্ধকার ক্রমশ বিস্তৃত ও ঘন হচ্ছে চারিদিকে। হয়তো রোজই হয়, এইভাবে।
এত অন্ধকার জীবনে কখনো দেখিনি।”^৭

এই অন্ধকার কুহকের বিবর জুড়ে বাস করে দুর্বোধ্যতা এবং অনিশ্চয়তা। অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতির মধ্যকার এই অন্ধকারে আমাদের গল্পকার কিন্তু মুক্তির আশ্বাস পাননি, পেয়েছেন ‘প্রেতলোকের জঘন্য সংকেত’। ‘নিয়ম’ গল্পে আবার তিনি দেখিয়েছেন শহর কীভাবে গ্রামের নিষ্পাপ সারল্যকে নির্লজ্জের মতো গ্রাস করছে।

8

মধ্যবিত্তদের জন্য অনেকেই লেখেন কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের লেখার হাত কোথাও যেন আলাদা। তাঁর পরিমিতবোধ বিজ্ঞানধর্মী, যা সাহিত্যক্ষেত্রে বিরল। নগরবাসীর জন্য লেখা গল্পগুলি কিন্তু নগরস্তুতি নয়। নগরের বৈভব, প্রলোভন, চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ, মিথ্যার বেশাতির প্রতি তীক্ষ্ণ সমালোচনা, ধিক্কার তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। নগরায়ণের ফাঁদে পড়া মানুষগুলোর আত্ম চিৎকার, মুখ ব্যাদন, সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা, অমানবিকতা, সর্বোপরি অনন্ত একাকিত্ব নির্মাণ করে তাঁর গল্পের মেরুদণ্ড। ‘মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ’ (১৩৭৪) গল্পের কথক মধ্যবিত্ত ভীরা, নীতি-নৈতিকতা, লোক-লৌকিকতা, অসাড় দাম্পত্য জীবন, মানসসম্মানের সামাজিক বন্ধনে জড়িয়ে কলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করছে, কিন্তু ক্রমাগত বাইরের লোকেদের, কখনো কখনো নিজেকেও ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি জীবন চূড়ান্ত অসুখে ভুগে ক্লান্ত হয়ে গেলেও আমরা মেক-আপের বহিরাবরণ দিয়ে নিজেকে যেভাবে সর্বজনসমক্ষে পেশ করি, তার দুর্দান্ত একটি উদাহরণ এই গল্পটি। আলোচনার স্বপক্ষে গল্পের কথকের কিছু স্বগতোক্তি তুলে ধরলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় —

“ঘরে যেমনই থাকি না কেন, বাইরে আমি খুব সুখী।”^৮

প্রতিনিয়ত বাইরের লোকেদের বোকা বানানোর পাশাপাশি, নিজের মনকে শান্ত করে রাখার জন্য কথক নিজেকেও ভুল বোঝায়, মিথ্যে আশ্বাস দেয় —

“আমার বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা নিঃশ্বাস হইচই করে উঠল। ব্যাপারটা ভাল লাগল না। তখন চোখ বন্ধ করে, গতি আগলে, অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় আমি ভাবলুম আমিই নায়ক, আমার দুঃখটা বড়ই আধুনিক, আজকের যে-কোনো লেখক আমাকে নিয়ে দৈনিক, সাপ্তাহিক গল্প লিখতে পারে।”^৯

‘মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ’ গল্পের কথক মুন্নির লাটুদা, যার বাইরের চাকচিক্য রয়েছে, বহু মানুষের তোষণ রয়েছে, কিন্তু অন্তরে প্রবল অশান্তি। স্ত্রীর সঙ্গে মন-কষাকষি তার মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। মধ্যবিত্ত ভীরুতা, নৈতিকতার বোধ তাকে সংসারে বেঁধে রাখে। স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যেস তাকে বহুতল অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে কারারুদ্ধ করে রাখে। এই কারাবাসের মাঝেই মেকি আবরণহীন কিশোরী মুন্নির সতেজতা, অকৃত্রিম সান্নিধ্য তাকে বন্ধন-মুক্তির জন্য হাতছানি দেয়। মুন্নি যেন তার কাছে সমাজ-বহির্ভূত এক বেনামি নির্জন দ্বীপ, যেখানে প্রকৃতির বুক ভরা শীতল বাতাস আছে, অর্থ-প্রতিপত্তি-সম্মানের গরাদবিহীন মুক্তির আশ্বাদ আছে। কিন্তু এরা কেউই সমাজের দায় থেকে আর কোনোদিন মুক্ত হবে না কারণ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্যের অভ্যেসের মধ্যে প্রবেশ করার পথ আছে, তবে মৃত্যু ব্যতিরেকে এই অভ্যেস থেকে বেরোনের আর কোনও পথ নেই। তাই সবশেষে গল্পের কথক (মুন্নির লাটুদা) বলে —

“জানি, আজকের এই দেখা হওয়াটাও মিথ্যে। তোর সরল, নিষ্পাপ জগৎ থেকে আমি যে অনেক দূরে পড়ে আছি, মুন্নি!”^{১০}

মুন্নি যেন যান্ত্রিক জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তির প্রতীক। কথক জানে স্বাচ্ছন্দ্য এবং অভ্যাসের এই যান্ত্রিক পরিসর থেকে তার মুক্তি নেই। সারল্যের সবুজ আভা তাকে এই বদ্ধতার মাঝে তাৎক্ষণিক শীতল বাতাসের আরাম দিতে পারে, কিন্তু চির-মুক্ত করতে পারে না। সামাজিক অবস্থান এবং দায়বদ্ধতার মাঝে তাকে মানসিক শূন্যতা নিয়ে এভাবেই চিরকাল গুমরে মরতে হবে। মাপা লেখনীর অসামান্য দক্ষতার পরিচয়বাহী প্রতিটি সংলাপ আমাদের মর্মমূলে এসে আঘাত করে। মুন্নির তরতাজা সারল্যের সুবাস, নব যৌবনের স্নিগ্ধতা, ছোটো ছোটো হ্যাংলামি, সহজতা লাটুদার মিথ্যের কঠিন আবরণকে নির্মমভাবে ভর্সনা করে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেরও —

“মুন্নি আমার ঠিক সেই ব্যাখার জায়গাটায় ঘা দিল। ...মুন্নি জানে না এই মুহূর্তে আমি কী ভীষণ অসহায়, আমি যা বলছি সবই বানিয়ে বলছি। বলছি জোর করে। আমার কোনো কথাই কথা নয়।”^{১১}

এই সামাজিক উপস্থিতির কোনো সারবত্তা নেই, কোনো ভিত্তিভূমি নেই, আছে শুধু মিথ্যার আশ্ফালন, দেখনদারির নিষ্ফল প্রয়াস।

৫

ভূমেন্দ্র গুহ (১৯৩৩—২০১৫) দিব্যেন্দু পালিত সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানিয়েছিলেন —

“দিব্যেন্দু নিজেকে নিয়ে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকত: কোনও গূঢ় ব্যক্তিগত কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার সুবাদেও আমার কাছে কখনও ভেঙেছে ব’লে আমার মনে পড়ে না।”^{১২}

আমাদের সংযমী মিতভাষী গল্পকার মুখে গূঢ় ব্যক্তিগত সত্যগুলি না বললেও একটু খেয়াল করে তাঁর লেখা পড়লেই বুঝতে পারা যায়, কী অমোঘ সত্যের ভাঙার সেগুলি। সেইসব গূঢ় সত্যের মুখোমুখি হলে আমাদের চমকে যেতে হয়, স্বরূপ দর্শন করে আঁতকে উঠতে হয়, লজ্জায়, হতাশায় চোখের কোণ আর্দ্র হয়ে ওঠে। ‘তিনকড়ির মা ও বোন’ (১৩৭৪) গল্পটি এই প্রসঙ্গে একটি জোরালো উদাহরণ হতে পারে। এই গল্পে তিনকড়ির মা হলেন দুবেলা গীতা পাঠ করা, ধার্মিক প্রকৃতির, ইংরেজি জানা শিক্ষিত সংস্কৃতির মাস্টারের স্ত্রী তৃপ্তিবালা। বিশ বছর সংসার করার পর তার কর্তা যখন মারা যায়, তার পরপরই মান-অপমানের টনটনে বোধ যুক্ত তৃপ্তিবালা হয়ে যায় তিনুর মা। অর্থাৎ, এদিন সে একজনের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিল, এখন তার দ্বিতীয় ধাপের পরিচয় শুরু হয় ছেলে তিনকড়ি ওরফে তিনুর মা হিসেবে। তার একটি মেয়েও আছে, নাম সুধা। কিন্তু সে যত না সুধার মা, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনুর মা। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিশ্চিত করে স্বামীর পর সংসারের পরবর্তী কর্তা তার ছেলে তিনকড়ি, মেয়ে সুধা নয়। তিনকড়ি বেকার, সংসারে টাকাকড়ি যা আসে সবটাই সুধা মারফত। তবু সুধা যেহেতু মেয়ে, তাই সমাজ-নির্ধারিত নিয়মে একদিন সে পরের বাড়ি চলে যাবে। তখন অল্পবিস্তর যাই রোজগার করুক, সেই ছেলের রোজগারের ওপরই তৃপ্তিবালাকে নির্ভর করতে হবে। সংসারের এই ক্লেদাক্ত একচোখোমিকে



সে অস্বীকার করতে পারেনি। বরঞ্চ এই স্বার্থপরতাকে মেনে নিয়েই সে মেয়েকে ধমক-ধামক দিয়ে, রাত-দিন গালমন্দ করে একজন যথোপযুক্ত ছেলেধরা বানানোর চেষ্টা করে যায় আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ছেলেকে খাতির যত্ন করে। স্বামী মারা যাওয়ায় তাদের সুনিশ্চিত রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে। তারপর থেকে প্রখর অপমানবোধসম্পন্ন তৃপ্তিবালা নিজের মেয়েকে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাড়িওয়ালার ছেলের ঘরে পাঠানোর মতো অবমাননাকর কাজ করতেও পিছপা হয়নি। তেইশ বছরের যে মেয়েকে পণ্য বানিয়ে সংসার নির্বাহ করে তৃপ্তিবালা, সংসারে সেই মেয়ের অবস্থান কিন্তু সবচেয়ে নিচু থাকে। মধ্যবিত্তের এই দ্বিচারিতা, চাদরের আড়ালে কুৎসিত লোভ-লালসা, পঙ্কিল জীবনযাত্রা, অভাব অনটন থেকে মুক্তির পথ হিসেবে হীনতা, ক্লিন্নতার পথ বেছে নেওয়ার নিদারুণ বাস্তবতার ছবি এই গল্পে ধরেছেন দিব্যেন্দু পালিত। মেয়েদেরকে তিনি বরাবরই তাঁর লেখায় নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সরাসরি তিনি জানিয়েছেন, নারী-মন জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতার কারণে তাঁর কাছে খানিক বেশি গুরুত্ব পায়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই সেই গুরুত্ববাহী। এই গল্পেও আমরা আমাদের সমাজের সেই সব গৃহবধূদের একজনকে পাই (তৃপ্তিবালা) যারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাবিকাঠি, যাদের কাজে লাগিয়ে সমাজ তার নিয়ামক শক্তি জারি করে, যারা মেয়ে হয়ে মেয়েদের শত্রুর ভূমিকা পালন করে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১৯৫০-২০১৫) *দহন* (২০০১) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মেয়েদের শারীরিক শুচিতা সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তব্য রয়েছে —

“—আমাদের মধ্যবিত্তদের এই দোষ। আগেই মেয়েটার সম্মান, শরীর এসব নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দিই। আরে বাবা, ছেলেরা নিজেদের দরকারে মেয়েদের শরীরের সম্মান বাড়ায়। নিজেদের দরকারেই আবার তাকে বিবস্ত্র করতে ছাড়ে না। — আমরা ছেলেরা চাই বলে মূল্য (শারীরিক শুচিতার) আছে। আমরা না চাইলেই নেই। চেস্টিটিটা কী জানেন ম্যাডাম? আমার যে ছেলেরা জন্মাচ্ছে সেটা যে আমারই, মানে আমিই যে তার বাবা, সেটা নিশ্চিত করে রাখার একটা অস্ত্র। ও অস্ত্রটা আমরাই চালাই। আমি যে সম্পত্তি বানাব, টাকা জমাব, সেটা একটা কোকিলের ছানা এসে ভোগ করবে এতো হতে পারে না! ...নিজের কাছে সং থাকাই সতীত্ব। সে ছেলেদের ক্ষেত্রেই হোক বা মেয়েদের ক্ষেত্রে।”^{১০}

এই কথাগুলিকে মাথায় রেখেই দিব্যেন্দু পালিতের ‘ধর্ষণের পরে’ (১৪০৫) গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা যায়। ছত্রিশ বছর বয়সি জয়িতা এই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে। সে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা রঙ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক যুবতী। তার স্বামী, বছর চুয়াল্লিশের শোভন সওদাগরি অফিসে একটি মাঝারি মাপের চাকুরিরত কর্মচারী। তাকে সবাই ‘বিবেকবান’ পুরুষ হিসেবেই চেনে। সৎভাবে সমাজ-সেবা করার জন্য সে পার্টির লোকাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত, তবে সে রাজনৈতিক কেরিয়ার নিয়ে কোনও উচ্চাশা পোষণ করে না। একটি দশ বছরের ছেলে ও একটি সাত বছরের মেয়ের মা-বাবা তারা। একদিন রাতে বাড়ি ফেরার পথে আকস্মিকভাবে তাদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। কিছু দুষ্কৃতকারীর দল শোভনকে আহত করে এবং জয়িতাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। শোভন পুলিশে রিপোর্ট করে। ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার তিনদিন পর সকালে সোনারপুরের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে জয়িতাকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে গ্রেফতার হওয়া দুজন দুষ্কৃতি ছাড়াও আরও দুজন তাকে ধর্ষণ করে। এই নৃশংস ধর্ষণের ঘটনার পর কী কী ঘটে, সমাজ জয়িতাকে কীভাবে ফিরিয়ে নেয়, আদৌ ফিরিয়ে নিতে পারে কিনা, জয়িতার শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, সন্তানেরা জয়িতাকে নিয়ে স্বাভাবিক হতে পারে কিনা, গণ-ধর্ষণের পর সমাজ তাকে কীভাবে গ্রহণ করে, আদৌ করে কিনা সেটা নিয়েই গল্প। বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং বস্ত্রবাদী, ভীতু, অসহায়, স্বার্থপর সমাজ যাকে জায়গা দিতে পারে না তাকে সমাজ-সম্মত বৈবাহিক প্রতিষ্ঠান জায়গা দেবে কী করে! জয়িতার শ্বশুর-শাশুড়ি চিত্তরঞ্জন এবং রেবা অন্তঃকরণ থেকে কামনা করে গেছেন ‘পাঁচ পুরুষের ঐঠো’ জয়িতা যেন আর তাদের সংসারে না ফেরে, সে যেন অত্যাচারের দরুন মারা যায় বা লজ্জায় গলায় দড়ি দেয়। অসুস্থতার কারণে বা অন্য যেকোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা আত্মীয়-পরিজনদের দুঃখিত করে, সত্যকারের না হোক দেখানো সহানুভূতির আবেগে আপ্তত করে। কিন্তু ধর্ষণজনিত দুর্ঘটনা আত্মীয়, পাড়াপড়শি, গোটা সমাজের কাছে একটা বিশী কৌতূহলের সঞ্চার করে। জয়িতার পরিবার একজন ধর্ষিতার পরিবর্তে লক্ষ্যজনের সমাজকেই বেছে নেয়।

‘বিবেকবান’ শোভন প্রাথমিকভাবে জয়িতার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত সে নিজের ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক শিকড়কে উপড়ে ফেলতে পারেনি। সেও শারীরিক শুচিতা-পবিত্রতার অশুচি ধারণাগুলির দ্বারা গ্রস্ত হয়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে কলুষিত করে ফেলে। শোভনের সর্বজনবিদিত সততা-নৈতিকতা তার নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ করেনি। শোভন-জয়িতার দাম্পত্যে বিচ্ছিন্নতার সূচনা কেবল এই দুর্ঘটনাটির কারণে নয়। পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুর, অনৈতিক, অশোভনীয়, একপেশে ধ্যান-ধারণাগুলির কাছে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে শোভন। তার সং এবং বিবেকবান হয়ে ওঠার সচেতন প্রয়াসকে গ্রাস করে ফেলে সামাজিক বিশ্বাসের আশ্রয় —

“গা তারও গুলোছে, আজ নয়, আগে থেকেই। কিন্তু, সে জয়িতার স্বামী —এ সব কথা ওইভাবে বলতে পারে না। রেবার কথাগুলোর মানে বুঝে তখন একটি কথাই ভেবেছিল শোভন, জয়িতাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে! নিজের জন্যে? ছেলেমেয়েদের জন্যে? না কি নিজের সম্পর্কে তার যা ধারণা সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে? এর একটাও কিংবা সব কারণগুলোই যদি সত্যি হয়, তাহলে কাল রাতে আলমারি খুলে জয়িতার কাপড়-জামা বের করতে করতে কেন সে ভেবেছিল, যারা ওকে ধর্ষণ করেছিল তাদের কারও যে এডস বা আরও কোনও সংক্রামক যৌনরোগ নেই তা সে জানছে কী করে! নিজেকে বাঁচানোর জন্যে কাল থেকে কি সে আলাদা বিছানায় শোবে? কিংবা, যে-জয়িতাকে সে ভালবাসত বলে জানত—অপহৃত হবার পরে এবং গণধর্ষণের খবর পাবার আগে যার জন্যে সে কেঁদেছিল— এখন আর তার জন্যে কোনও টান অনুভব করছে না কেন?

প্রশ্নগুলো নিজেকেই। কিন্তু, উত্তর ধরা দিচ্ছে না এখনও। বরং কেমন যেন হাত-পা ছাড়া লাগছে। কিছুটা অসহ্যও। এমনও মনে হচ্ছে, জীবিতের চেয়ে সে যদি মৃত জয়িতাকে আনতে যেত, সেটা অনেক বেশি সহনীয় হত।”^{২৪}

সমাজের কাছে জয়িতারা নির্যাতিত বা অত্যাচারিত নয়, তারা শুধুই ‘নষ্ট’, ‘বহুভুজ’, কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মানুষ হিসেবে নয়, বস্তুসামগ্রী হিসেবে দেখে। *দহন* উপন্যাসে এই রকমই এক দম্পতিকে দেখতে পাওয়া যায়। রমিতা আর পলাশ, তারা সদ্য বিবাহিত। ফুরফুরে মেজাজে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে রমিতাকে এক দল ছেলে আক্রমণ করে। পলাশকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে রমিতাকে তারা গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিল সেই সময় শ্রবণা সরকার নামক একজন অত্যন্ত সাহসী মেয়ে শুধুমাত্র ব্যাগ দিয়ে দুষ্কৃতীদের নাস্তানাবুদ করে। রমিতার স্ত্রীলতাহানি হয় বটে তবে সে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। তা সত্ত্বেও তার জীবন আর কোনোদিন স্বাভাবিক হয়নি। ‘ধর্ষণের পরে’ গল্পে জয়িতার শ্বশুর-শাশুড়ি যেমন শোভনের থানা-পুলিশ করা নিয়ে প্রবল আপত্তি করেছিল, ঠিক তেমনি শ্রবণা কেন রমিতাকে নিয়ে পুলিশে গেল, কেন রমিতা নিজের ছেঁড়া ব্লাউজ ছেড়ে থানার বড়ো বাবুর মেয়ের ব্লাউজ গায়ে চড়াল, তা নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আপত্তির অবধি ছিল না। থানা-পুলিশ মানেই কোর্ট-কাছারি, লোক-জানাজানি আর তাতেই নাকি তাদের শ্বশুরবাড়ির দীর্ঘদিন ধরে লালিত বনেদিয়ানা, মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, দুষ্কৃতীদের শাস্তি পাওয়া নিয়ে সমাজ বা সমাজের প্রতিনিধিদের কোনও মাথাব্যথা নেই, সমাজের আপত্তি এরকম কদর্য ঘটনা চাউর হওয়া নিয়ে। এক্ষেত্রে সমাজ নির্মমভাবে নির্যাতিত মেয়েটিকে সমাজ-দেহ থেকে বিয়োগ করবে কিন্তু সমাজের অভিভাবক পুরুষদের আঁচলের তলায় নিরাপদ আশ্রয় দেবে। ২০১৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ‘পিঙ্ক’ নামের একটি হিন্দি ছবি মুক্তি পায়। তাতেও দেখানো হয়েছে মেয়েটির পোশাক, তার কুমারীত্ব আদৌ বহাল আছে কি নেই, সে মাদকাসক্ত ছিল কিনা, তা নিয়ে সমাজ যতখানি চিন্তিত, সেই তুলনায় দুষ্কৃতীদের দুষ্কর্ম নিয়ে মোটেই ভাবিত নয়। সিনেমায় অবশ্য শেষপর্যন্ত মেয়েটি সুবিচার পায় কিন্তু আলোচ্য গল্পে জয়িতা সুবিচার পেয়েছিল কিনা তা জানতে পারা যায় না। তবে এটুকু বোঝা যায়, পুরুষশাসিত সমাজ জয়িতাদের জীবিত অবস্থায় আগের মতো করে কোনোমতেই ফিরিয়ে নেবে না। শারীরিক ধর্ষণের ঘটনার পর সমাজ তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না, ক্রমাগত মানসিকভাবে ধর্ষণ করে যাবে। ধর্ষিতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় মরে গিয়ে বেঁচে যায় অথবা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ক্রমাগত মানসিক নির্যাতন করে তিলে তিলে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

গল্প মানে শুধুই বানানো কিছু গাঁজাখুরি মনোরঞ্জক নয়, গল্প হতে পারে জীবনের অমোঘ সত্য দর্শনের, নিজেদের স্বরূপ দর্শনের নিখুঁত কাহিনি। সেই ভাবনার দায়ভার বহন করেন গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত। কলকাতার নাগরিক হিসেবে তিনি এই নগরের এবং নাগরিকদের অখণ্ড জীবনসত্যকে সাহিত্যে পেশ করেছেন।

Reference:

১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, 'কল্যাণী পালিত-এর সাক্ষাৎকার', সাক্ষাৎকার গ্রহণ : নন্দিতা রায়, গল্ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ৬৯-৭০
২. দত্ত, হর্ষ (সম্পা.), *বইয়ের দেশ*, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬, 'দিব্যেন্দু পালিত', সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়, এবিপি প্রা: লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১২১-১২২
৩. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১)*, 'মাছ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৪৭
৪. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি - মার্চ ২০০৩, 'আপোসহীন লেখক : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়', গল্ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৬
৫. Mumford, Lewis. *The Culture of Cities*. A Harvest/HBJ Book. Harcourt Brace Jovanovich. Orlando. Florida 32887. Copyright 1938 by Harcourt Brace Jovanovich. Inc. Copyright renewed 1966 by Lewis Mumford. P. 258
৬. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, 'আপোসহীন লেখক : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়', গল্ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৬ - ১৭
৭. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১)*, 'অন্ধকারের পেরিয়ে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৩৩
৮. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১)*, 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১৮২
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
১০. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১)*, 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১৮৭
১১. পালিত, দিব্যেন্দু, *গল্প সমগ্র (১)*, 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৭, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১৮৬
১২. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, 'দিব্যেন্দু: ভূমেন্দ্র গুহ', গল্ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ৩৭
১৩. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *দহন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ৬৬
১৪. পালিত, দিব্যেন্দু, 'ধর্ষণের পরে', *গল্পসমগ্র (২)*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৫৩০